ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ৯. ৬. দীন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র সংস্কার

আমরা বলেছি যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি দিক রাষ্ট্র। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা মুসলিমদের জন্য ফরয কিফায়া। তবে এ বিষয়ে খারিজীগণ, বিশেষত আধুনিক খারিজীগণ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। তারা দাবি করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বড় ফরয। তাদের দাবীর দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়: প্রথমত বিশ্বে কোথাও ‘‘ইসলামী রাষ্ট্র’’ নেই, বরং সকল মুসলিম রাষ্ট্রই ‘‘কাফির’’ রাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় ফরয। মূলধারার আলিমদের সাথে এদের দাবির পার্থক্য দুটি:

প্রথমত, মূলধারার আলিমগণের মতানুসারে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলি বিচ্যুতি ও পাপাচার সত্ত্বেও ‘‘ইসলামী রাষ্ট্র’’ বা ‘‘দারুল ইসলাম’’; কাজেই মুমিনের দায়িত্ব শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে সংস্কার ও সংশোধন করা। সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব রাষ্ট্র সংস্কার ও সংশোধন। আর রাষ্ট্র প্রশাসন ও সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রাখা, শরীয়তের বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় জিহাদ পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সংশোধন ইত্যাদির দায়িত্ব সাধারণভাবে ফরয কিফায়া, কখনো ফরয আইন, তবে কখনোই বড় ফরয নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, সমকালীন প্রাজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ কোনো কোনো আলিম ও গবেষকের কিছু কিছু বক্তব্য ‘জামাআতুল মুসলিমীন’ তাদের মতামতের দলীল হিসেবে পেশ করতেন। এ সকল বক্তব্য থেকে তারা যা প্রমাণ করতেন এ সকল আলিম সে অর্থে তাঁদের কথা বলেন নি। ইসলামী দাওয়াত, আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তন, দীনের বিজয়, দীন প্রতিষ্ঠা, জাহিলী সমাজ বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব বুঝাতে তারা যে সকল কথা বলেছেন এ সকল আবেগী যুবক সেগুলিকে ‘‘বেদবাক্যের’’ মত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাদের আবেগকে আরো বেশি শানিত করেছেন। এভাবে আবেগতাড়িত উগ্রতায় নিপতিত হয়েছে। কখনো বা এভাবে তাদের আবেগ উজ্জীবিত করে তাদেরকে বিপথগামী করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। খারিজীগণের প্রমাণাদির মধ্যে ছিল:

প্রথমত, জিহাদ বিষয়ক নির্দেশাবলি

তারা দাবি করতেন যে, জিহাদ বড় ফরয। আর জিহাদের উদ্দেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা হয় তা জিহাদ বলে গণ্য। কাজেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জিহাদ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই বড় ফরয। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ‘‘বড় ফরয’’ পরিভাষাটিই কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয়। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া কোনো ইবাদতকে ‘‘বড় ফরয’’ বলা যায় না। আরকানে ইসলামের পরে আর কোনো ইবাদতকে ঢালাওভাবে বড় ফরয বলার সুযোগ নেই। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ সাধারণত ফরয কিফায়া এবং কখনো বা ফরয আইন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়। রাষ্ট্র সংস্কারও হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে নয়।

দ্বিতীয়ত: প্রতিপালকের খিলাফাত

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

‘‘যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন ‘স্থলাভিষিক্ত’ সৃষ্টি করছি।’’[1]
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করে তারা বলেন যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালনের খিলাফাত বা প্রতিনিধির দায়িত্ব প্রদান করেছেন। রুবূবিয়্যাতের এ দায়িত্ব পালনই মুমিনের বড় ফরয। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য। বস্তুত তাদের এ ‘‘দলীল’’-টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত। তবে এ আয়াতটির সাথে এ দায়িত্বের কোনো সম্পকই নেই।

খলীফা অর্থ ‘স্থলাভিষিক্ত’ বা ‘গদ্দিনশীন’, যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে ‘খলীফা’ বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করবেন, কার স্থলাভিষিক্ত তা বলেন নি। মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধ: (১) ইবনু আববাস (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে ‘স্থলাভিষিক্ত’ বলতে পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়েছে। (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে ‘খলীফা’ বা স্থলাভিষিক্ত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে পারে। অর্থৎ আদম ও তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই স্থলাভিষিক্ত।[2]

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল ব্যবহারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়। এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপত্তি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্থলাভিষিক্ত, গদ্দিনশীন বা খলীফার প্রয়োজন হয়। আর মহান আল্লাহ তো এরূপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র। কুরআনে কোথাও মানুষকে ‘আল্লাহর খলীফা’ বলা হয় নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হন। যেমন সফরের দু‘আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন: ‘‘আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে (আমাদের) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।’’[3] একব্যক্তি আবূ বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা। তখন তিনি বলেন, ‘‘আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।’’[4]
এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে তৃতীয় মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিয়াগণ এ ব্যাখ্যাকে তাদের মতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে মানুষ আল্লাহর খলীফা। আর আল্লাহর খিলাফাতের পরিপূর্ণতা

ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। এজন্য তাদের বিশ্বাস অনুসারে ইমাম আল্লাহর গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, দীনের বিজয়

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি দীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করবেন। এ সকল আয়াত থেকে তারা দাবি করেন যে, দীনকে বিজয় করার দায়িত্ব উম্মাতের বড় ফরয। আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত ও ব্যাখ্যা বর্জন করে, শুধু নিজের মন ও মনন দিয়ে কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করা এবং এ অর্থের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা খারিজীগণের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল। নিঃসন্দেহে দীনের বিজয় ইসলামের নির্দেশনা। তবে বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মাধ্যমে জানতে হবে। আমরা এখানে এ সকল আয়াতের অর্থ ও এর ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণের মতামত আলোচনা করব।

মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনিই প্রেরণ করেছেন তার রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দীন-সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।”[5] কুরআনে আরো দু স্থানে আল্লাহ অনুরূপ কথা বলেছেন।[6] এ সকল স্থানে আল্লাহ তাকে সকল দীনের উপর “ইযহার”করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইযহার অর্থ প্রকাশ করা। বিজয় করা অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। ইবনু আববাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ “আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সকল ধর্মের সকল তথ্য প্রকাশ করবেন বা জানিয়ে দিবেন; যদিও ইহূদী-খৃস্টান ও অন্যন্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের এ সকল বিষয় প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করত।”

অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে প্রকাশ বা বিজয় বলতে তাত্ত্বিক প্রকাশ বা বিজয় বুঝানো হয়েছে। সকল দীনের উপর প্রকাশ বা বিজয় বলতে সকল দীনের অনুসারীদের এ দীন গ্রহণ করা বা সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরে মুসলিম রাষ্ট্রের বিজয় বুঝানো হয় নি। বরং তত্ত্বে, তথ্যে, প্রমাণে ও যুক্তিতে সকল দীনের উপর এ দিনকে আল্লাহ প্রকাশিত ও বিজয়ী করবেন বলে বুঝানো হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ দীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশ দান করবেন। সে সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ এ দীন গ্রহণ করবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহরই হবে।[7]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম উম্মাহর ক্রমপ্রসারিত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

إنَّ اللهَ زوى لي الأرضَ,فرأيتُ مشارقَها ومغاربَها وإنَّ أُمَّتي سيبلغُ ملكها ما زُوِيَ لي منها

‘‘আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দেখলাম। আর পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল তার তাবৎ স্থানে আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।’’[8]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار) لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام (هذا الدين) بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من اهلها أو يذلهم فيدينون لها)

‘‘দিবারাত্র যেখানে পৌঁছে সেখানেই এ দীন পৌঁছাবে। এ ধরাপৃষ্ঠে এমন একটি বাড়ি বা তাবুও অবশিষ্ঠ থাকবে না যেখানে এ দীন পৌঁছাবে না। প্রতিটি বাড়িতেই আল্লাহ এ দীন পৌঁছাবেন, কারো সম্মানের সাথে কারো লাঞ্ছনার সাথে। কাউকে আল্লাহ দীনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করবেন। আর কেউ এর বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হবে।[9] বস্তুত আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)_এর মাধ্যমে দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। যুক্তি ও প্রমাণে তাঁর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দীনকে প্রকাশিত ও বিজয়ী করেছেন। আর এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।

এমন নয় যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয় কোনো এক সময় একেবারে হারিয়ে যাবে এবং এরপর আমাদেরকে নতুন করে বিজয়ের যাত্রা শুরু করতে হবে। বরং বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তীগণের কর্মধারার আলোকে আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রত্যেকের নিজের জীবনে দীন পালন, নিজের সাধ্যমত দীনের দাওয়াত, দীনের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন, ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মিথ্যাচার উন্মোচন, ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা ইত্যাদি। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আদর্শিক ও দীনী সংস্কার ইত্যাদির জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু বিজয় অর্জনের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কর্ম বা সুন্নাত-বহির্ভুত কোনো পদ্ধতির অনুসরণ আমাদের দায়িত্ব নয়। অনুরূপভাবে ফলাফলের চিন্তা আমাদের দায়িত্ব নয়।

চতুর্থত: দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করার জন্য তারা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন। তাদের মতে, দীন অর্থই রাষ্ট্র এবং ‘‘দীন প্রতিষ্ঠা’’-র অর্থই ‘‘দীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা’’। আর এ দায়িত্ব হলো সবচেয়ে বড় ফরয। কারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দীনের অন্যান্য অনেক দায়িত্ব পালন করা যায় না বা দীনের অন্যান্য অনেক বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বস্তুত মহান আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা দীনের অংশ। দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সুন্নাত নির্দেশিত পথে আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

‘‘তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকেএবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।’’[10]

এখানে আল্লাহ এ সকল নবী-রাসূলকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অধিকাংশ মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এখানে ‘‘দীন’’ বলতে ‘‘তাওহীদ’’ বুঝানো হয়েছে; কারণ সকল নবীর মূল দীন ছিল তাওহীদ। শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কুরআন কারীমে নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেও বিষয়টি বুঝা যায়। কুরআন কারীমে ২৫ জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নাম উল্লেখ না করে অন্য নবীদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সকলের ক্ষেত্রেই ‘‘তাওহীদ’’-কেই তাদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তাদের সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, সকল বিপদে শুধু তাঁকেই ডাক, একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাও, তাঁরই জন্য সাজদা কর, তাঁরই উপর নির্ভর কর, তাঁরই জন্য উৎসর্গ, কুরবানী ও জবাই কর। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যাদের বা যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার ইবাদত বর্জন কর, তাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা অবিশ্বাস কর। অধিকাংশ নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে ‘‘তাওহীদ’’ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় উল্লেখ করা হয় নি। কয়েকজন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে তাওহীদের পাশাপাশি চারিত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন যে, সকল নবীকেই ‘‘দীন প্রতিষ্ঠার’’ নির্দেশ দিয়েছেন, আর অধিকাংশ নবীই তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছুর দাওয়াত দিয়েছেন বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এজন্য অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ তাওহীদ পালন ও তাওহীদের দাওয়াত। অন্য অনেকে দীন বলতে তাওহীদ ও আহকামের সমষ্টি বুঝিয়েছেন। কারণ প্রত্যেক নবীকে তাঁকে প্রদত্ত দীন কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[11]
‘‘ইকামতের দীন’’ বা দীন প্রতিষ্ঠা বলতে অধিকাংশ মুফাস্সির ‘‘দীন পালন’’ বা ‘‘দীনের নির্দেশনা অনুসারে কর্ম করা’’ বুঝিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন:

وعنى بقوله: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) أن اعملوا به على ما شرع لكم وفرض كما قد بينا فيما مضي قبل فى قوله: (أقيموا الصلاة). وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال اهل التأويل ... عن السدى فى قوله، فى قوله (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) قال: اعملوا به

‘‘‘দীন প্রতিষ্ঠা কর’ কথাটির অর্থ হলো ‘দীন পালন কর’ বা ‘দীন অনুসারে কর্ম কর, যেভাবে তোমাদের জন্য তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ফরয করা হয়েছে’, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে ‘সালাত প্রতিষ্ঠা কর’ কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। পূর্ববর্তী (সাহাবী-তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী যুগের) মুফাস্সিরগণ এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। .... তাবিয়ী ইসমাঈল ইবনু আব্দুর রাহমান সুদ্দী (১২৮ হি) বলেন ‘দীন প্রতিষ্ঠা কর’ অর্থ দীন পালন কর।’’[12]
এ অর্থে তাবিয়ী মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) বলেন:

والإقرار بالله وطاعته فهو اقامة الدين

''আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন সকলকেই সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর এ-ই হলো দীন প্রতিষ্ঠা করা।''[13]
অন্য তাবিয়ী আবুল আলিয়া রুফাইয় ইবনু মিহরান (৯০ হি) বলেন:

اقامة الدين الا خلاص لله وعبادته

''দীন প্রতিষ্ঠা হলো আল্লাহর জন্য ইখলাস ও তাঁর ইবাদত করা।''[14]
কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন:

والمراد باقامته: تعديل اركانه وحفظه من ان يقع فيه زيغ، والمواظبه عليه والتشمير فى القيام به

''দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ: তার রুকনগুলি যথাযথ পালন করা, তার মধ্যে বিকৃতির অনুপ্রবেশ থেকে তাকে সংরক্ষণ করা, দীন পালনে নিয়মানুবর্তী হওয়া এবং তা যথাযথ পালনের জন্য পূণউদ্দ্যোমী হওয়া।''[15] এভাবে অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ী ও প্রাচীন মুফাস্সিরের মতানুসারে পরিপূর্ণ পালনই প্রতিষ্ঠা করা। যেমন সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ 'যেভাবে ফরয ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে তা আদায় করা'। আমরা দেখেছি যে, বিজন প্রান্তরের নির্জনবাসী 'আবিদ' বান্দার একাকী সালাত আদায়কেও হাদীসে ''ইকামাতে সালাত'' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তার জন্য যে ভাবে ফরয ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে তা পালন করেছেন।

বস্তুত নিজের জীবনে দীনের পরিপূর্ণ পালন অর্থ নিজের জীবনে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ অন্য কোনো মানুষকে পরিপূর্ণ দীনের মধ্যে আনয়ন করা মুমিনের আয়ত্বাধীন নয়; এক্ষেত্রে মুমিনের আয়ত্বাধীন হলো অন্যকে দীন পরিপূর্ণ পালনের আহবান জানানো। কেউ আহবান প্রত্যাখ্যান করলে তাকে জবরদস্তি করে তা পালন করানোর ক্ষমতা বা দায়িত্ব মুমিনের নেই।
উপরের আয়াতে উল্লেখিত চারজন রাসূল: নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁদের মধ্যে নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি বা রাষ্ট্র ও জিহাদ বিষয়ক কোনো দাওয়াত দেন নি। তাঁরা তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, নেক কর্ম, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ক দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সমাজের অত্যন্ত অল্প মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁদের দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে নি। মূসা (আঃ) অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তার জাতিকে জিহাদের দাওয়াত দেন। তার জাতি তা পালন করতে অস্বীকার করে। তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

''হে আমার প্রতিপালক, আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া আর কারো উপর আমার কর্তৃত্ব-মালিকানা

নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও ফাসিক মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও।’’[16]
এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল নবী-রাসূল মূলত নিজের জীবনে দীন পালন এবং দীনের দাওয়াতের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেই দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যরা গ্রহণ না করায় বা সমাজে বা রাষ্ট্রে দীন ক্ষমতাবান না হওয়ায় তার দীন পালনের দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে নি।
আমরা আরো দেখছি যে, অন্যরা গ্রহণ করুক অথবা না করুক তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, অর্থাৎ নিজের জীবনে দীনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া দীন পালনেরই অংশ।
এজন্য কোনো কোনো মুফাস্সির দীন প্রতিষ্ঠা বলতে দীন পালন ও দীনের দাওয়াত বুঝেছেন। হিজরী ৭ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুল আযীয- ইয্য ইবনু আব্দুস সালাম (৬৬০ হি) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

أَقِيمُوا الدِّينَ) اعملوابه أو ادعوا اليه)

‘‘দীন প্রতিষ্ঠা কর: অর্থাৎ দীন পালন কর অথব দীনের প্রতি আহবান কর।’’[17]
কোনো কোনো মুফাস্সির দীন প্রতিষ্ঠা করা বলতে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনকে আঁকড়ে ধরা বুঝিয়েছেন; কারণ এখানে বলা হয়েছে ‘‘দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না।’’ এথেকে বুঝা যায় যে, দীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং দীনের বিষয়ে দলাদলি করার অর্থ দীন প্রতিষ্ঠা না করা। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব ফিরোযআবাদী (৮১৭ হি) তার সংকলিত ‘‘তানবীরুল মিকবাস’’ নামক তাফসীর গ্রন্থে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) أمر الله جملة الانبياء أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ: أن انفقوا في الدين (وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) لا تختلفوا في) الدين

‘‘‘দীন প্রতিষ্ঠা কর’: আল্লাহ সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা কর: অর্থাৎ দীনের বিষয়ে ঐকমত হও ‘এবং তাতে দলাদলি করো না’ অর্থাৎ দীনের বিষয়ে মতভেদ করো না।’’[18]
ইমাম তাবারী ও অন্যান্য মুফাস্সির প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির কাতাদা ইবনু দিআমাহ (১১৫ হি) থেকেও অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন।[19] এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) বলেন:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أي: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالاءتلاف والجماعة ونهاهم) عن الا فتراق والاختلاف

‘‘দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না: অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন ভালবাসা ও ঐক্যের এবং নিষেধ করেছেন দলাদলি ও মতভেদ থেকে।’’[20]
এখানে উলেখ্য যে, কুরআন কারীমে আর কোথাও ‘‘ইকামাতে দীন’’ বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয় নি। হাদীসে নববীতেও ‘‘ইকামতে দীন’’ কথাটি কোথাও কোনোভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। ইসলামী ফিকহে ‘‘ইকামতে দীন’’ বলে কোনো পরিভাষা নেই। বাহ্যত এর কারণ হলো, দীন একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এর বহু দিক রয়েছে। প্রত্যেক দিকের জন্য পৃথক বিধান রয়েছে। সকল বিষয়ের সামষ্টিক পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতা

দীনের ইকামত। প্রত্যেক বিষয়ের ইকামত বা পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতা ইকামতে দীনের অংশ। প্রত্যেক বিষয়ের ‘‘ইকামত’’ বা পালন, দাওয়াত ও ঐক্যবদ্ধতার পৃথক বিধান রয়েছে। কাজেই ‘‘ইকামতে দীন’’ নামে কোনো পৃথক পরিভাষা বা বিধান প্রদান করা হয় নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আর দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো নিজের জীবনে দীনকে প্রতিপালন করে প্রতিষ্ঠিত রাখা। পাশাপাশি অন্যদেরকে তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে দাওয়াত দেওয়া এবং দীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাও ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

দীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, কর্ম, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রদান করেছে। সকল বিধানই দীন এবং প্রত্যেকের নিজের জীবনে যে বিধান প্রযোজ্য তা আল্লাহর নির্দেশনা মত পালন করা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। পাশাপাশি দীনের সকল বিষয়ের দাওয়াত প্রদানও দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। তাওহীদ, ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, পরিবার, হালাল-হারাম, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ মত পালন করা, পালনের দাওয়াত দেওয়া ও পালনে ও দাওয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকা দীন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক। দীনের যে কোনো বিষয় পালন ও দাওয়াতই দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। যে মুমিন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রয়েছেন তার জন্য দীনের অন্যান্য বিধানের ন্যায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দীনের বিধান পালন করা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ। আর অন্যান্য মুমিনের জন্য এ বিষয়ে তাকে ও অন্যান্য সকলকে দাওয়াত দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠার অংশ।

আমরা আগেই বলেছি, ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্বের বিষয়ে দীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো মুসলিমই দ্বিমত পোষণ করবেন না। তবে দীন অর্থ শুধু রাষ্ট্র বলে মনে করা, শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে দীন প্রতিষ্ঠা বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করলে বড় ফরয তরক হবে এবং অন্য কোনো ইবাদত কবুল হবে না ইত্যাদি চিন্তার কোনো শরীয়তসম্মত ভিত্তি নেই। রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুত্বের বিষয়ে জামাআতুল মুসলিমীন তাদের লিখনি ও বক্তব্যে যে সকল যুক্তি পেশ করতেন সেগুলির অন্যতম হলো, রাষ্ট্রব্যবস্থা না হলে দীনের অনেক বিধান পালন করা যায় না এবং একমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে থাকলেই সমাজের সর্বস্তরে দীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তাদের এ কথার মধ্যে সত্যতা রয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ইসলামীকরণের গুরুত্ব বুঝাতে দীনী দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এরূপ কথা বলেন। কিন্তু জামাআতুল মুসলিমীন এ কথাকে ভুল অর্থে ব্যবহার করতেন। এ যুক্তি দিয়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে বড় ফরয বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন। আমরা দেখেছি যে, কোনো ইবাদতকে কোনো যুক্তি দিয়ে বড় ফরয বলা যায় না, বরং এজন্য কুরআন-সুন্নহের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। এ যুক্তি দিয়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আরকানে ইসলাম, অন্যান্য ‘ফরয আইন’, ওয়াজিব বা ব্যক্তিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বর্জন করা বা হারাম-মাকরূহ কর্মে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করতেন। এগুলি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে দেখেছি যে, আরকানুল ইসলাম ও অন্যান্য ফরয-নফল ইবাদত পালনই মুমিনের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রে বা বিজন প্রান্তরে, সমাজে বা একাকী, মুসলিম দেশে বা অমুসলিম দেশে সকল অবস্থায় ও স্থানে মুমিন ইবাদত-বন্দেগী পালন করবেন। জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা ইবাদতের

নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যম বা উপকরণ। এরা বিষয়টিকে উল্টা করে বুঝেন। তারা বলেন, জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতাই মুমিন জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আরকানুল ইসলাম ও অন্যান্য ইবাদত সবই জিহাদ ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সংরক্ষণের উপকরণ মাত্র। এজন্য রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সবই করা যায় বা সবই বাদ দেওয়া যায় বলে তারা দবি করতেন।

এছাড়া তারা বুঝাতেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের আগে তাওহীদ, আহকাম, ইলম, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির পালন ও দাওয়াত গুরুত্বহীন। যারা এগুলির পালন ও দাওয়াতের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার বা দীনের এদিকগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন তাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী বলে গণ্য করতেন। একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের প্রচেষ্টাকেই তারা দীন প্রতিষ্ঠা বলে মনে করতেন। তাদের এ সকল মতামত দীন, দীন প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণের কর্মপদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত, মানবপ্রকৃতি ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রগাঢ় অজ্ঞতার সাথে আবেগের সংমিশ্রণের ফল।
রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন বা দখল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে না। হাজার বছরের মুক্তিযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক কর্মকান্ড, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্ষমতার পরিবর্তন বা দখল অসম্ভব হতে পারে। দখল হলেও তা বেদখল হতে পারে। দীন প্রতিষ্ঠা বা দাওয়াতকে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধীন বলে চিন্তা করা দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ও অবাস্তব চিন্তা।

রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার প্রয়োগে নিয়োজিত মানুষ- এ দুয়ের সমন্বয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়। খিলাফাতে রাশিদার পরে ইসলামী ব্যবস্থা একইরূপ আছে, কিন্তু ব্যবস্থার প্রয়োগের মানুষের পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের পরে আর কখনোই তাঁদের মত মানুষ আসবে না। এজন্যই বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ‘‘মন্দ’’ ও ‘‘ভাল’’ আসবে, তবে কখনোই প্রথম সময়ের মত হবে না।
আর খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল মুসলিম সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, কোনো সরকারই সমাজের পাপ, অনাচার ইত্যাদি দূর করে নি। রাষ্ট্র বা সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করেছে এবং ভাল বা মন্দভাবে আইনের প্রয়োগ করেছে। ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, আল্লাহর পথে দাওয়াত ইত্যাদি মূলত আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও দায়ীগণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ‘‘ভাল’’ ইসলামী রাষ্ট্র বড়জোর দাওয়াতের পরিবেশ রক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে অনেক ‘‘খারাপ’’ ইসলামী রাষ্ট্র দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করেছে। কাজেই রাষ্ট্র হলেই সব হয়ে যাবে অথবা রাষ্ট্র না হলে কিছুই হবে না- এরূপ চিন্তা মানব প্রকৃতি ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা-প্রসূত আবেগতাড়িত কথা। ‘‘মন্দ’’ বা ‘‘ভাল’’ উভয় অবস্থায় ‘‘দায়ী’’-গণ দাওয়াত এগিয়ে নিবেন। দাওয়াতের মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জুলুম, অনাচার, অত্যাচার ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন দূর করতে এবং ভাল বা দাওয়াত-বান্ধব (DawahFriendly) সরকার লাভ করতে চেষ্টা করবেন।
অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের অবিদ্যমানতায় বা বিচ্যুতিতে মুমিনের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মুমিন পাপী হয় বলে চিন্তা করার কোনো শরীয়ত সম্মত ভিত্তি নেই। এ কথা বলা যায় যে, বিবাহ না করলে, সম্পদ না থাকলে বা ক্ষমতা না থাকলে দীনের অনেক বিধান পালন করা যায় না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বিবাহ করা, সম্পদ অর্জন করা বা ক্ষমতা লাভ করা সবচেয়ে বড় ফরয। অথবা বলা যায় না, যে মুমিন শরীয়ত সম্মত ওজরের কারনে বিবাহ করেননি, সম্পদশালী হতে পারেন নি বা ক্ষমতাশালী হতে পারেন নি তিনি তার সাধ্যমত দীনের বিধানগুলি পালন করলেও তা কবুল হবে না বা তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন।

যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রয়েছেন তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে পাপী হবেন। যার সম্পদ আছে তার জন্য যাকাত দেওয়া যেমন ফরয, যার ক্ষমতা আছে তার জন্য ক্ষমতা আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করা, দুনীতি বন্ধ করা, অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও তেমানি ফরয। অন্যরা এ বিষয়ে দাওয়াত দেওয়ার পরেও সংশিষ্টরা না মানলে তাদের পাপ থাকে না। কাজেই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, আবেগ বা দ্রুত ফলাফলের জন্য শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজকে ‘‘বড় ফরয’’ পালনের অযুহাতে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি এ দায়িত্ব পালনের অযুহাতে কোনো সুন্নাত-মুসতাহাব কর্ম পরিত্যাগও মুমিনের দায়িত্ব নয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম পদ্ধতি অনুসরণও মুমিনের জন্য ক্ষতিকর।

ফুটনোট

[1] সূরা (২) বাকারা: ৩০ আয়াত।

[2] তাবারী, তাফসীর ১/১৯৯-২০০; কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ১/২৬৩-২৭৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৭০-৭১।

[3] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৭৮।

[4] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৮৪, ১৯৮।

[5] সূরা (৯) তাওবা: ৩৩ আয়াত।

[6] সূরা (৪৮) ফাতহ: ২৮ আয়াত ও সূরা (৬১) সাফ্ফ: ৯ আয়াত।

[7] তাবারী, তাফসীর ১৪/২১৫-২১৬; কুরতুবী, আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন ৮/১২১; ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ৩/১৭০।

[8] মুসলিম আস-সহীহ ৪/২২১৫।

[9] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১০৩; ৬/৪। হাদিসটি সহীহ। আলবানী, সহীহাহ ১/৩২।

[10] সূরা শুরা: আয়াত ১৩।

[11] তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ২১/৫১৩; আবূ হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (৭৪৫ হি.), আল-বাহরুল মুহীত ৯/৪৮২; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৭/১৯৫; কুরতুবী আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন ১৬/১০।

[12] তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ২১/৫১৩।

[13] আবু হাইয়ান মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (৭৪৫ হি.), আল-বাহরুল মুহীত ৯/৪৮২।

[14] আবু হাইয়ান, আল-বাহরুল মুহীত ৯/৪৮২।

[15] ইবনু আজীবাহ, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (১২২৪), আল-বাহরুল মাদীদ ৫/৪২৩।

[16] সূরা (৬) মায়িদা: আয়াত ২৫।

[17] ইয্য ইবনু আব্দুস সালাম, তাফসীরুল ইয্য ১/১০৫১।

[18] ফিরোযআবাদী, তানবীরুল মিকবাস (শামিলা) ২/৪।

[19] তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ২১/৫১৩।

[20] ইবনু হাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (শামিলা) ৭/১৯৫।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6929

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন